৪. শার্ঙ্গদেব রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে আলোচিত তথ্যাবলীর পরিচয় দাও।

— এয়োদশ শতাব্দীর অন্যতম সঙ্গীত শাস্ত্রী হলেন — শার্ঙ্গদেব। তাঁর পিতামহ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কাশ্মীর অঞ্চল থেকে দাক্ষিণাত্যে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতা সোড্ঢলদেব দাক্ষিণাত্যের দেব নগরে বাস করতেন। ইনি প্রথমে রাজা ভিল্লম এবং রাজা সিংহন (১২০৮–১২৪০) খ্রী: এর দরবারে মহাকরনিক (Head Clerk) ছিলেন। সিংহনের রাজত্বকালে সম্ভবত ১২১০ খ্রী: শার্ঙ্গদেব'র জন্ম হয়। অল্পবয়স থেকে শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত পারদর্শী হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় সিংহন এর রাজত্বকালে অর্থাৎ ১২৪৮–১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময় 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থটি রচিত হয়। সর্বভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি হল শেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ। এরপরে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতধারা পৃথক হয়ে পড়ে মূলত: অর্থাবর্তের মুসলমানী শাসকদের সংস্কৃতির প্রভাবে।

শার্ঙ্গদেব তার পূর্বসূরী হিসাবে ভরত, মতঙ্গ প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সাঙ্গীতিক তথ্যাদি তিনি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তবে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য দিয়ে তিনি বিষয়বস্তুর মর্মমূল ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে গেছেন। 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থটি ৭ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে সঙ্গীতের নানা আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি, এই অধ্যায়গুলি হল —

1. স্বরগতাধ্যায়
2. রাগবিবেকাধ্যায়
3. তালাধ্যায়
4. প্রবন্ধাধ্যায়
5. প্রকীর্ণকাধ্যায়
6. বাদ্যাধ্যায়
7. নৃত্যাধ্যায়

শার্ঙ্গদেব এর 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে

বোঝা যায় তিনি গান্ধর্ব রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন অভিজ্ঞ ছিলেন। এছাড়া প্রাচীন ধ্বরলিপি পদ্ধতির একটি উন্নততর রূপ তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন যার মাধ্যমে জাতি রাগে কিছু উদাহরন তিনি লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। শার্ঙ্গদেব 'নিঃশঙ্ক' নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এটি তাঁর ছদ্মনাম বিশেষ। অনেকে মনে করেন তাঁর এই নাম সার্থক কারন নিঃশঙ্কচিত্তে সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি যা মন্তব্য করে গেছেন আজও তা আমরা খন্ডন করতে পারিনি।

নাট্যশাস্ত্রের মতোই তিনি পঞ্চগীতির উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল— শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারনী। অবশ্য গান্ধর্ব ও গানকে সমষ্টিগতভাবে তিনি গীত আখ্যা দিলেও গান্ধর্ব ও গানকে একই শ্রেনীভুক্ত করেননি। ব্রহ্মগীতিরূপে সাতটি কপাল ও কম্বল গীতির পরিচয় দিয়েছেন তিনি তবে মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি গ্রামরাগগীতি শুদ্ধা, ভিন্না, প্রভৃতি পঞ্চগীতির সমগোত্রীয় নয় একথা শার্ঙ্গদেব এর 'সঙ্গীত রত্নাকরের' টীকাকার উল্লেখ করেছেন।
(কল্লিনাথ এরা দুজনেই)

ভরতের সময় গান্ধার ও নিষাদের বিকৃত ভাব স্বীকৃত ছিল। শার্ঙ্গদেব এই দুটির সঙ্গে ষড়জ ও মধ্যমেরও বিকৃত ভাব স্বীকার করেছেন। ~~এছাড়াও~~ এগুলিকে তিনি চ্যুত ষড়জ এবং চ্যুতমধ্যম হিসাবে বর্ননা করেছেন। এছাড়াও পঞ্চমেরও বিকৃতভাব সম্ভব বলে শার্ঙ্গদেব স্বীকার করেছেন। গানের বিভিন্ন প্রকরণের চেয়ে তিনি তানের উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তানের ক্ষেত্রে তিনি— একস্বর, দ্বিস্বর, ত্রিস্বর, চতুর্স্বর প্রভৃতির সমন্বয়ের কথা বলেছেন। এই প্রকারে তিনি মধ্যম, গ্রামিক, ঔড়ব, শঙ্খচূড়, গজঝম্পা, রৌদ্রাক্ষ, বিষ্ণুবিক্রম প্রভৃতি।

নাট্যশাস্ত্রে চারপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের কথা উল্লেখ আছে। 'সঙ্গীত রত্নাকরেও' তত, ঘন, অনবদ্ধ ও সুষির এই চারপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের প্রসঙ্গে আলোচনা আছে বাদ্যাধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীনার প্রচলনই এইসময় বেশী ছিল কারন শার্ঙ্গদেব প্রায় ১০ রকম বীনার নাম উল্লেখ করেছিলেন, এগুলি হল — একতন্ত্রীবীনা, ত্রিতন্ত্রীকা, নকুল, চিত্রাবীনা, বিপঞ্চী, আলাপিনী, কিন্নরী, মত্তকোকিলা, নিঃশঙ্কবীনা এবং পিনাকীবীনা। অনেকে মনে করেন ত্রিতন্ত্রীকাবীনা থেকেই পরবর্তীকালে সেতার যন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে।

শার্ঙ্গদেব নাট্যশাস্ত্রকারের মতই 'ধাতু'র ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন বীনা বাজাবার যে কৌশল রঞ্জকতা দান করে তাই হল 'ধাতু'। ধাতু হল মূলতঃ সাঙ্গীতিক ধ্বনি উৎপন্ন করার এক পরিশীলিত এবং ব্যবহারিক প্রক্রিয়া। ধ্রুববীনা এবং চলবীনার সাহায্যে কিভাবে শ্রুতি সম্পর্কে একটি ধারনা করা যায় তা শার্ঙ্গদেব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 'সারণা চতুষ্টয়' নামক — পরীক্ষার মাধ্যমে।

বিভিন্ন স্বর সম্পর্কে স্বরগতাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব আলোচনা করেছেন বাদী স্বর, সমবাদী স্বর ছাড়াও বিবাদী এবং অনুবাদী স্বর সম্পর্কেও আলোচনা পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থে। মূর্ছনা প্রসঙ্গে ভরতের মতই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শার্ঙ্গদেব, তবে মতঙ্গের মতই সপ্তস্বর এবং দ্বাদশ স্বর মূর্ছনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। জাতিরাগ যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেইভাবে জাতিগানের প্রচলন আজ আর নেই তবে বর্তমান রাগসঙ্গীতের মূল কাঠামো যেহেতু জাতিরাগের মধ্যেই নিহিত ছিল, সেইহেতু 'সঙ্গীত রত্নাকর'এ জাতিরাগের আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ন বলে মেনে নিতে হয়। আর একটি কারণে এই আলোচনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল শার্ঙ্গদেব জাতিগানের মাধ্যমে প্রথম স্বরলিপি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। 'সঙ্গীত রত্নাকর'এ

এই রকম উদাহরণ পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী মূলতঃ প্রবন্ধ সঙ্গীতের যুগ। শার্ঙ্গদেব তাঁর গ্রন্থে এই বিষয়ক একটি অধ্যায় সংযোজনা করেছেন। এই ধরনের বিস্তৃত আলোচনা অন্য কোন গ্রন্থে আর পাওয়া যায় নি। প্রবন্ধের অঙ্গ এবং জাতি বিশ্লেষণ করে যথাবিধি প্রবন্ধ গানের পরিচয় দিয়েছিলেন শার্ঙ্গদেব। অনেকে মনে করেন প্রবন্ধের একটি বিশেষ প্রকরণ, 'সালগ-সূড়'- এর অন্তর্গত ধ্রুব প্রবন্ধ থেকেই পরবর্তী পর্যায়ে ধ্রুপদ গানের সৃষ্টি হয়েছে।

জাতিগান প্রসঙ্গে আলোচনায় শার্ঙ্গদেব তালের প্রসঙ্গ এনেছেন। এছাড়া তাল বিষয়ক একটি অধ্যায়েরও সংযোজন করেছেন তিনি। প্রাচীন মার্গতালের পাশাপাশি দেশী তালের বেশ কয়েকটির বর্ণনা তিনি করেছেন। এমনকি নিজের নাম অনুসারে একটি তালের তিনি নামকরণ করেছেন 'নিঃশঙ্ক তাল'। গায়কের দোষগুন প্রসঙ্গেও শার্ঙ্গদেবের মতামত গ্রহণযোগ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুলতানী শাসনের প্রভাবে উত্তর-ভারতের সঙ্গীত জগতের পরিবর্তন এলেও শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থটিকে সর্বজনীন সঙ্গীতের শেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে আজোও চিহ্নিত করা হয়।